প্রাবল্য

(গল্পগ্রন্থ – বেণীগীর ফুল বাড়ি)

কথাটি শুনিয়া মন খারাপ হইয়া গেল। পাশের ঘরের বধূটির মেয়ের নাকি ভারী অসুখ। দিন দশ ধরিয়া লক্ষ্য করিতেছিলাম, তাহার অনিন্দ্যসুন্দর হাস্যমুখর মুখখানি দুর্ভাবনার ছায়াপাতে ম্লান হইয়াছে। তাহার অনর্গল কলকণ্ঠ ক্ষান্ত হইয়াছে। সে প্রভাত হইতে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত আমার স্ত্রীর সহিত কত অসংখ্য গল্প করিত—হাসিয়া হাসিয়া খুন হইত। আজ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাবৎ তাহাদের সহিত তাল রাখিয়া আমাদের নিঃসন্তান সংসার-জীবন বহিয়া যাইতেছিল।

রমার বয়স বেশি নয়, বড় জোর বছর একুশ হবে। কিন্তু এই অল্প বয়সেই সে রীতিমত পাকা গৃহিণী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কথায় এবং কর্মে সর্বত্র সেই আভাস পাওয়া যায়। রবিবারে দাড়ি কামাইলে নাকি শরীরের বৃদ্ধি কমিয়া যায়, বৃহস্পতিবারে আমিষ ভক্ষণ করিলে কোন্ এক দুষ্ট দেবতার কোপে পড়িতে হয় ইত্যাদি অগণিত বিধিনিষেধের বেড়াজালে নিজেকে বদ্ধ করিয়া অতি সন্তর্পণে সে দিন গুনিয়া যাইতেছিল। তিন প্রাণীর সমবায়ে তাহার ক্ষুদ্র সংসার গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে...তাহার কর্মব্যস্ত স্বামী...ও স্বর্গের পরীর মত ছোট্ট একটি ফুটফুটে মেয়ে। এখনও তাহার ঠিকমত কথা ফুটে নাই। বয়স অতি অল্প বলিয়া টলিয়া টলিয়া চলিতে থাকে। কারণে অকারণে রাঙা ঠোঁট দুখানি কাঁপাইয়া হাসিয়া ওঠে। তাহার নামকরণ করিয়াছে 'কমলা', কিন্তুসচরাচর ডাকে 'কমলি' বলিয়া।

আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সে কমলাকে বড় ভালবাসে। অষ্টপ্রহর তাহাকে কাছে কাছে রাখিয়া দেয়। তাহাকে খাওয়ানো, স্নান করানো সমস্ত খুঁটিনাটির ভার আমার স্ত্রী স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে। সারাদিন সে আমাদের ঘরেই থাকে। রাত্রে তাহার মা আসিয়া ডাকে, কমলি কোথায় দিদি?

স্ত্রী কহিল, ঘুমুচ্ছে ভাই।

রমা বলিল, রাতেও রেখে দেবে নাকি?

স্ত্রী কহিল, থাকত যদি তো রাখতুম; কিন্তু ভাই, রাতদুপুরে মা'র জন্য যদি কাঁদে!

রমা কহিল, অত আশকারা দিয়ো না দিদি।

স্ত্রী কহিল, আশকারা নয় ভাই, আশকারা নয়। তুমি ছেলেমানুষ, ছেলে মানুষ করার কি জান?

রমা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, কি মিথ্যুক গো তুমি! ছেলে মানুষ করার সব কিছু তোমার জানা আছে বুঝি? না জানি পেটের পাঁচটা হলে কি দেমাকই না হত!

স্ত্রীর মুখ মুহূর্তের জন্য পাংশু হইল। তাহার বক্ষ দলিয়া পিষিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইল। রহস্যের ছলে কথাটি মুখ দিয়া বাহির হইয়া আর একজনকে যে এরূপভাবে আঘাত করিতে পারে, রমা হয়তো তাহা জানিত না। ওই শব্দগুলি জোড়া দিয়া একটি যে বিশ্রী শ্রুতিকটু বাক্যের সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা রমার অবিদিত ছিল। সে অপ্রস্তুতে পড়িল। আমার স্ত্রীর হাতদুখানি চাপিয়া ধরিয়া করুণ সুরে মিনতি করিল, রাগ করলে দিদি? আমি না বুঝে একটা কথা বলে ফেলেছি।

রমার কাতর মুখ দেখিয়া স্ত্রীর পাষাণ-হৃদয় দ্রব হইল। সে ঠোঁটের ফাঁকে হাসি আনিয়া কহিল, ওমা! কি এমন মন্দ কথা বলেচ ভাই? ও আমার বরাত। তবে কি জান, মেয়েটা আমায় একেবারে আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে।

রমা কহিল, ওর মা যে কে তাই ও ভাল করে বুঝতে পারে না। আর জন্মে তুমি ওর মা ছিলে নিশ্চয়।

স্ত্রী কহিল, মাইরি বলছি, বিচ্ছেদ যদি আমাদের মধ্যে কখনও হয় তো তোমার আমার সঙ্গেই হবে। কমলি যেন তার মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে। ও যেখানে খুশি থাকবে।

রমা হাসিতে লাগিল, বলিল, এখন থেকে অত ভাবনা নেই তোমার দিদি। দেখে নিয়ো ও ঠিক তোমার কাছেই থাকবে।

স্ত্রী কহিল, ওকে দু'দণ্ড না দেখতে পেলে আমার বুকের ভেতরটা কেমন কেমন করে।

আশ্চর্য হইয়া গেলাম, আমার স্ত্রী কিসের জোরে কমলিকে এমন নিবিড়ভাবে ভালবাসিয়া ফেলিল! কেমন করিয়া দিনে দিনে পলে পলে তাহার উষর বাৎসল্যবর্জিত জীবনমরুতে স্নেহপ্রেমের বিরাট মহীরুহ সৃষ্ট হইল! কেমন করিয়া তাহার নিষ্ফল হৃদয় নিঃস্বার্থভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া একজন অচেনাকে দুহাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিল ! সত্য কথা বলিতে কি, আমার স্ত্রী কমলিকে তাহার জননীর চেয়ে বেশি ভালবাসিত বলিয়া বোধ হইত।

একদিন স্ত্রী কমলিকে কোলে শোয়াইয়া দুধ খাওয়াইতেছিল। তাহার মুখের মধ্যে ঝিনুক পুরিয়া কহিল, তুই দিন দিন ভারি দুষ্টু হচ্ছিস বাপু! বসে দুধ খেতে শিখবি কবে?

আমি কহিলাম, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে।

স্ত্রী আমার প্রতি একটি বিলোল কটাক্ষ হানিয়া কহিল, তুমি থাম দিকিন। দেখছিস তো কমলি, তোর জন্যে লোকের পাঁচশো কথা শুনতে হয়। দাও দিকি গামছাটা, মুখ হাত পা মুছিয়ে দেব।

গামছা দিয়া কহিলাম, অতটা ভাল নয় সরো।

সরো অর্থাৎ সরোজিনী, আমার স্ত্রী। কহিল, মানে?

মরীয়া হইয়া বলিলাম, যাই হোক, পর ভিন্ন তো আর কিছু নয়।

আমার মুখ দিয়া আর কথা সরিল না, তাহার অবকাশও পাইলাম না। স্ত্রী তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করিল, তোমার ওই এক সৃষ্টিছাড়া কথা! দেখ, ও অলুক্ষুণে কথা আমায় কখনও বোলো না। আমার কমলি-মাকে তুমি পর ভাবতে পার, কিন্তু আমি পারি না। মরে গেলেও পারব না। কমলি, তুই আমায় পর ভাবিস?

কমলি নেহাত ছেলেমানুষ। সংসারের এই সব তীক্ষ্ণ বাক্যের অর্থ জানিত না। সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল, ধ্যেৎ!

সুতরাং আমার একটিও কথা বলিবার রহিল না।

কমলাকে মধ্যস্থ করিয়া আমাদের দাম্পত্যজীবনে মাঝে মাঝে কলহ হইত। আজ তাহার খেলনা চাই—কাল তাহার পোশাক চাই—তার পরদিন জরির জুতো চাই। এই অসংখ্য অভাব অভিযোগ পূরণ করিতে করিতে আমি অস্থির হইয়া উঠিতাম। আমি মানুষ—অমন নিঃস্বার্থভাবে জানিয়া শুনিয়া পরের জন্য এতটা ত্যাগস্বীকার করিতে রাজি নই। স্ত্রী কহিত, তোমার হাত দিয়ে যদি জল গলে!

আমি কহিলাম, যেন জন্মে জন্মে না গলে।

স্ত্রী কহিল, ছিঃ ছিঃ! লোকে বলবে কি?

কহিলাম, জান, বেচারা কাক কোকিলের ডিমে তা দেয়।

আসলে আমি কমলিকে আদৌ সুনজরে দেখিতাম না।

এহেন কমলির নাকি অসুখ—অসুখ নাকি সহজ নয়, কারণ ডাক্তার পর্যন্ত মুখ ঘুরাইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে নাকি আরও আগে দেখানো উচিত ছিল। আমি আশ্চর্য হইয়া কহিলাম, বল কি? আগে তো শুনি নি!

বিশুষ্ক মুখে স্ত্রী কহিল, মা আবাগী কি বলেছে সে কথা?

আমি কহিলাম, বড়ই দুঃসংবাদ।

স্ত্রী যুক্তহস্ত ললাটে ঠেকাইয়া কহিল, মা মঙ্গলচণ্ডী, তুমি আমার বাছাকে ভাল করে দাও মা।

ব্যস্তভাবে বাজারের থলি খুঁজিতে খুঁজিতে কহিলাম, বাজার থেকে আজ কি আসবে বল তো?

স্ত্রী কহিল, আজ আর বাজারে গিয়ে কাজ নেই। তুমি বরং দুটো চিঁড়ে-মুড়কি খেয়ে আজ আপিস যাও।

কহিলাম, আর তুমি?

স্ত্রী কহিল, আমার কথা আমি ভাবব।

অগত্যা ফলার খাইয়া সেদিন যথাসময়ে আপিসে হাজির হইলাম। যাহা হউক, সেখানে তো আর স্নেহমমতার বালাই নাই—সেখানে স্ত্রীর ন্যায় আবদার খাটিবে না। আত্মীয়-স্বজনহীন, শূন্য প্রাণহীন, কর্মমুখর আপিস।

কমলির অসুখ আঁকাবাঁকা পথে মোড় ঘুরিতে ঘুরিতে আগাইয়া চলিল। আমার স্ত্রীর মন সংসারে আর বসিল না কিছুতেই—ভাত গলে না কিংবা গলিয়া যায় অত্যন্ত;তরকারিতে ঝাল বেশি হয় কিংবা ঝালই হয় না; হয়তো নুন বেশি হয় কিংবা আদৌ হয় না।স্ত্রীর তো ঠিকমত খাওয়াই হয় না। প্রাণধারণের জন্য ওই যা দুবেলা দুটো দাঁতে কাটা। রাত্রি-দিন সে অক্লান্তভাবে কমলির সেবা করিতে লাগিল। আমি একদিন কহিলাম, শেষকালে তুমিও কি পড়বে।

স্ত্রী উদাস কণ্ঠে কহিল, জানি না।

বলিলাম, জানি না নয়, অমনি করে মিছিমিছি নিজের বিপদ ডেকে এনো না।

স্ত্রী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, কি পাষাণ গো তুমি!

সুতরাং সেইখানেই সে প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল।

সেদিন রবিবার।

বিকালবেলা স্ত্রী কহিল, আমি উনুনে আগুন দিচ্ছি। কোথাও যেয়ো না যেন। সকাল সকাল আজ খেয়ে নাও।

প্রশ্ন করিলাম, কেন?

স্ত্রীর গণ্ড বাহিয়া মুক্তার ন্যায় অশ্রুকণা ঝরিতে লাগিল, ভাঙা ভাঙা সুরে সে কহিল, কি জান, আজ যেন মেয়েটাকে ভাল বুঝছি না। সত্যি আমার হাত পা অবশ হয়ে গেছে। কোনো কাজ আর ভাল লাগছে না।

সন্ধ্যার পরই খাইতে বসিলাম। অর্ধেক খাওয়া হইয়াছে, এমন সময়ে পাশের ঘরে রমা চিৎকার করিয়া উঠিল, ওরে কমলারে, তুই কোথায় গেলিরে?

সেই বিচ্ছেদবেদনাবিধুর ক্রন্দন-শব্দে আকাশ বাতাস রি-রি করিয়া উঠিল। স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিল, তাহার হাত হইতে ভাতের থালা পড়িয়া গেল। সে জড়িতকণ্ঠে কহিল, পাতের গোড়ায় একটু জল দাও।

আমি স্ত্রীর কথা পালন করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। স্ত্রী কহিল, ওকি, খেলে না যে বড়?

বলিলাম, পাষাণ গলে গেছে।

স্ত্রী নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করিল। পরক্ষণেই মিলিত কণ্ঠে দুইজনে ঘোররবে দিকে দিকে মৃত্যুর বার্তা পৌঁছাইয়া দিল। রমার স্বামী সমস্ত পুরুষত্ব খোয়াইয়া ঘরের কোণে বসিয়া বার বার ডুকরাইয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। আমি হেন নিষ্ঠুর ব্যক্তিরও চক্ষু যেন ছল ছল করিয়া উঠিল। কমলি এ মরজগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। সহস্র ব্যাকুল আহ্বানেও সে ফিরিয়া আসিবে না। এ কথা স্মরণ করিতে কোথা হইতে এক অনির্দেশ্য উদ্বেল বায়ু কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের পথ বহিয়াআসিয়া মধ্যপথ হইতে কেন জানি ফিরিয়া গেল। আমার বুক কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিলাম—কখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে। ভাবিলাম, সমস্ত কর্তব্যভার আমার উপরই ন্যস্ত হইয়াছে। আমি না করলে কমলির সৎকারের কোনো সম্ভাবনা নাই। কমলির বাপের নিকট গিয়া বলিলাম, রবীনবাবু, আপনি একটু স্থির হোন।

স্থির হওয়া তো দূরের কথা, রবীনবাবু বালকের ন্যায় আমায় জড়াইয়া ধরিয়া আকুল হইয়া উঠিল, কি হবে দাদা!

প্রবোধ দিলাম, আঃ। আপনার এত বিচলিত হলে চলবে কেন? আপনি পুরুষ-মানুষ। জানেন তো ভগবান বলেছেন, 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ'।"

কথাটা নিজের কানেই যেন বিঁধিতে লাগিল। আমার কথায় কোনো কাজ হইল না। রবীনবাবু বিন্দুমাত্র তাহাতে কর্ণপাত করিল না।

সুতরাং আমি লোক-সংগ্রহের জন্য বাহির হইলাম। ন'টার সময় ফিরিয়া সেই একটানা ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। সেই সুর করিয়া করিয়া পরপারবর্তী বধির যাত্রীর নিকট অসংখ্য অভিযোগ। দেখিলাম ইহার মধ্যেই আমার স্ত্রীর গলা ভাঙিয়া গিয়াছে। সে মেঝের উপর লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছে, ওরে কমলিরে, পর বলে কি এমনি করে ফাঁকি দিতে হয় রে!

আর রমা? তাহাকে দেখিয়া অবাক হইলাম। সে কমলির বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্তহইয়া পড়িয়াছে... তাহার কণ্ঠস্বর বিকৃতপ্রায় হইয়াছে—তাহার চক্ষু দুটি ফুলিয়া রাঙা হইয়া গিয়াছে... পিঠের উপর জমকাল চুলগুলি লুটাইয়া পড়িয়াছে।

স্ত্রী কহিল, বাছার একখানা ফটো তুলে রাখ গো। তা না হলে আমি কখনও বাঁচব না।

সুতরাং একখানি ফটো তোলা হইল। সেই নিমলিত চক্ষু, বিবর্ণ মুখের বীভৎস ছবি। সঙ্গীদের মধ্যে একজন বলিল, ওইটুকু মেয়ের আবার ফটো তোলা কেন?

স্ত্রী মেঝের উপর মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে সুর সপ্তমে চড়াইয়া কাঁদিল, ওরে কমলি রে, তুই কেন অভিমান করে চলে গেলি রে?

কঠিন মেঝের আঘাতে কোমল কপাল ফুলিয়া উঠিল। তাহার সেই অশান্ত ক্রন্দন, সেই আর্তনাদ যেন মর্ত্যভূমি ত্যাগ করিয়া অন্তহীন ইথার-সমুদ্র বাহিয়া স্বর্গের রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া ইহজগতে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। আমরা নিষ্ঠুরের ন্যায় নিজেদের কর্তব্য পালন করিতে লাগিলাম। রমার বুক হইতে তাহার প্রাণের পুত্তলীকে দুর্জয় বিক্রমে ছিনাইয়া লইলাম। নিশ্চেতন রমার শরীর স্পন্দিত হইল। সে কাতর ডাগর রাঙা চোখদুটি তুলিয়া মিনতি করিল, না—না—না, আমি যেতে দেব না।

মুহূর্তের জন্য আমার হাত অবশ হইল, সমস্ত কর্মশক্তি শিথিল হইল। ভবতারণ কহিল, সব মাটি করে ফেলছ খুড়ো। পুরুষমানুষের অত কোমল হলে চলে না। সরো দিকিনি।

রমা 'মাগো' বলিয়া মেঝের উপর আছড়াইয়া পড়িল। আমার স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া আমার পা আঁকড়াইয়া ধরিল, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ সোনামণিকে আমার? আমি প্রাণ থাকতে যেতে দেব না, তার আগে আমার মরণ হোক গে।

তাহার কথায় কর্ণপাত করিলাম না। অবকাশও আর ছিল না।

সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল। হাঁ, মা'র চেয়ে মেয়েটাকে বেশি ভালবাসত সরোজিনী—আমার সহধর্মিণী। আঘাতটা নাকি তাহাকেই বেশি করিয়া হানা দিয়াছে।

সাত দিন সাত রাত্রি ধরিয়া সরোজিনী একটানা সুরে শোক করিয়া চলিল। মুখে তাহার খাদ্য রুচিল না... রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হইল... মধ্যাহ্নে সাংসারিক কর্মে অবহেলা করিয়া মাঝে মাঝে চিৎকার করিতে লাগিল। সেই ফটোখানি বুকে চাপিয়া কমলিকে কতরূপে কত ছলে এই ধরাতলে পুনরায় ফিরিয়া আসিবার জন্য

অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহার ক্লান্তিহীন শোকের গভীরতা দেখিয়া আমারই ভাবনা হইল। একদিন বলিলাম, সরো, তুমি একটা কথা শোন।

সে অশ্রুসজল চোখ দুটি তুলিয়া বলিল, কি?

বলিলাম, নিজেকে তোমার বাঁচতে হবে। বল, এমনি করে খাওয়া-দাওয়া ত্যাগকরলে কি কমলি ফিরে আসবে? না আসতে পারে?

সরোজিনী অসহায়ের মত হতাশ সুরে বিষণ্ণভাবে বলিল, সত্যি আর সে আসবে না?

বলিলাম, পাগল! কখনও কি কেউ এসেছে? তুমি জেনেশুনে এমন ছেলেমানুষের মত কাজ কর! লক্ষ্মীটি আমার কথা শোন, দুটি খেয়ে নাও, কথার অবাধ্য হয়ো না।

কত সাধ্য-সাধনা করিলাম। আশপাশের কয়েকজন প্রতিবেশী আসিয়া অজস্র সান্ত্বনা দিতে লাগিল। তখন স্ত্রী বহুকষ্টে জীবনধারণের জন্যই যা দুটি অন্ন মুখে দিল। সরোজিনীর শোকাতিশয্যে সকলেই রমার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কমলির বিচ্ছেদ-বেদনায় তাহার যে বত্রিশ নাড়ী মোচড়াইয়া অসংখ্য ক্ষতের সৃষ্টি করিতে পারে, যাহা কোনোরূপ প্রলেপেই আরোগ্য হইতে পারে না—তাহা ভাবিবার আমাদের ফুরসৎ ছিল না।

এই ঘটনার মাস দেড়েক পর একদিন আপিস হইতে ফিরিয়া আমি স্ত্রীর পানে চাহিয়া অবাক হইয়া গেলাম। তাহার মুখ দুর্ভাবনায় শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। হাত-মুখ ধুইয়া বসিতেই বলিল, একটা কথা বলি শোন, হেসে উড়িয়ে দিয়ো না।

বলিলাম, কি কথা শুনি?

সরোজিনী অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, আর একটা বাড়ি দেখ, এ বাড়িতে আর একদণ্ডও থাকতে পারব না, মাইরি বলছি।

কথাটি আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিল। বাড়ি-বদল সহজ ব্যাপার নয় কোনো মতেই। পাঁচ বৎসর নির্বিঘ্নে অনড় অবস্থায় এইখানে রমাদের সন্নিকটে দুটি পরিবারের স্নেহবন্ধনে দিনযাপন করিতেছিলাম। আজ অকস্মাৎ সেই সুগঠিত পরিপাটি নীড় ভাঙিবার আদেশ হইল। দুর্বাসার অভিশাপ বোধ হয় এ আদেশের সহিত তুলনীয় হয় না। বিচলিত চিত্তে কহিলাম, অপরাধ?

স্ত্রী তখন বিশদভাবে অপরাধ ব্যাখ্যা করিল। সে এক অভিনব অপরাধ। কেন জানি না, রমা কমলির ব্যবহৃত বিছানাগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। সেই বিছানার উপর শুইয়া কমলি নাকি নিশ্চিন্ত আরামে দেহত্যাগ করিয়াছিল। সরোজিনী তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। এমন কি ফটোতে পর্যন্ত তাহার ছবি উঠিয়াছে। রমা সেই বিছানাগুলি প্রতিদিন নাড়িয়া চাড়িয়া কারণে অকারণে কাঁদিতে থাকে। সেগুলিকে সযত্নে পবিত্রভাবে বাক্সের মধ্যে তুলিয়া রাখিয়াছে। স্ত্রী কহিল, সত্যি বাপু, ও আমি কখনও সহ্য করতে পারব না। ছিষ্টি রি-রি কচ্ছে, একটু বাছ-বিচার নেই! আমার ঠাকুর রয়েছে, দেবতা রয়েছে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আজই তুমি বাড়ি ঠিক করে এস।

কথাটি শুনিতে বা বলিতে খুব সহজ। কহিলাম, রমারা কি মনে করবে সরো?

সরোজিনী বলিল, তাই বলে তো আমি ইহপরকাল খোয়াতে পারি না। জেনেশুনে পাপ করি কি করে বল!

বলিলাম, কমলিকে তুমি না রমার চেয়ে বেশি ভালবাস? আড়াই টাকা দিয়ে তো ফটো তুললে?

সরোজিনী কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, ওগো দোহাই তোমার, আর দগ্ধে মেরো না। এই নাও কমলির ফটো। বেঁচে থাকতে তো একদিনও বাছাকে আমার একটুও ভালবাস নি, মরে গিয়েও তার রেহাই নেই!

কথার শেষে সে কমলির ফটোখানি নিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। বাতাসে ভর করিয়া সেই ফটো দূরে উড়িয়া গেল।

অগত্যা আমায় সে বাড়ি অচিরেই ত্যাগ করিতে হইল। রমাদের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইল। জানিয়া শুনিয়া তো আর পাপ করিতে পারি না। আচার-বিচার আগে, না আগে ভালবাসা।

আশ্চর্য মানুষ!